



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 471 - 477

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধুসূদন দত্তের প্রহসন : নারী চরিত্রের আলোকে পুরুষ চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন

পীযুষ কান্তি মণ্ডল

গবেষক, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : mandalpiyushkanti@gmail.com

Received Date 10. 04. 2025

Selection Date 23. 04. 2025

Keyword

Farce, female character, Renaissance, sociography, social problems, conservative, Hypocrisy,

Abstract

Madhusudan Dutta first appeared in Bengali literature as a playwright. It was through his hand that Bengali readers got the first taste of a successful Bengali tragedy. Within just three years of theatrical practice, he wrote several full-length plays, including two successful farces. The two farces he wrote are - 'Ekei ki bole sabhyata?' (1860) and 'Buro Saliker ghara row' (1860). If we judge the two farces in terms of their content, it will be seen that Michael Madhusudan Dutta has painted two opposite poles in the two farces. Just as in the first, he has shown the hypocrisy of the English-educated new community, in the second, he has highlighted the hypocrisy and characterlessness of the old conservative society. Madhusudan Dutta has depicted two different forms of society in his two farces. The playwright has tried to portray the broken form of this hypocritical society mainly through male characters. And the female characters are introduced to reveal the nature of these male characters.

Through the characters of Barbilasini, Payodhari and Nitambini mentioned in the farce, the playwright has shown the addiction of the radical modern youth society to drinking, dancing, singing and barangana women. Again, through the character of Harakamini, he has highlighted the sorrows and sufferings of the wives of the young men of the modern new community educated in the so-called English education. Again, the playwright has also given a language of protest through this Harakamini character, from which he did not hesitate to rebuke the Babus like Nabakumar. Also, in the character of the housewife blinded by her son's love, the playwright has shown that the housewife has tried to hide the faults and shortcomings of her son. That is, the character of the main character of this farce, Nabakumar, has somehow emerged through these female characters. That the character of Harakamini is used to highlight the fact that characters like Nabakumar have no responsibility towards their wives, the character of Prasannamayi is used to highlight the fact that in a foreign culture, they kiss their sister on the cheek, and the character of the housewife who is blinded by her love for her son directly reveals the character of Nabakumar.

In the farce "Buro Saliker Ghara Row" the playwright has created several female characters including Fatema, Puti, Bhagi, Panchi to reveal the character of the old landlord Bhaktaprasad. Although the female characters in this farce represent their respective levels, the real purpose of creating the female characters is to reveal the character of the false Bhaktaprasad. The character of the woman-loving Bhaktaprasad is revealed through his desire to enjoy Fatema. Through the character of Puti, the playwright has shown that Womanizer people like Bhaktaprasad have been ruining the lives of many women for a long time. They do not take up religious activities when they find female company. The playwright is creating the character of Bhagi to highlight how opportunistic the Womanizer Bhaktaprasad is. Again, after seeing Bhagi's daughter Panchi, Bhaktaprasad is fascinated by her appearance and plans to enjoy her. The playwright has created the character of Panchi to highlight the Womanizer mentality of the landlord. In other words, the playwright has created the female characters in the play to highlight the hypocrisy of the main character of the play, Bhaktaprasad.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে রেনেসাঁসের দ্বারোদঘাটনের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪ - ১৮৭৩)। তিনি একাধারে নাট্যকার ও কবি, অন্যদিকে আবার তাঁরই হাত ধরে সমকালীন সমাজ সমস্যা ও সমাজ চিত্রায়ণের প্রয়োজনে প্রথম সার্থক প্রহসন বাঙালি পাঠক উপহার পায়। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু যথার্থই বলেছেন -

“যতদিন বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙালি জাতির অস্তিত্ব থাকিবে ততদিন বঙ্গসাহিত্য হইতে ‘শ্রীমধুসূদন’ নাম বিলুপ্ত হইবে না।”^১

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব সর্বপ্রথম নাট্যকার রূপেই। আর প্রহসন হল নাটকেরই একটি শাখা, এই সত্যটি মধুসূদন দত্তের প্রহসনের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে গোলোকনাথ দাস(?) জোড়বেরেলের - ‘The Disguise’ নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন। এটি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম প্রহসনধর্মী রচনার নিদর্শন।^২ ১৮৫৩ সালে বাংলা ভাষায় প্রথম মৌলিক প্রহসন কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘বাবু’ নাটিকাটি।^৩ এরপর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের ‘কুলীনকুল-সর্বস্ব’ প্রহসনটি অনেকাংশে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও, ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রচিত ও ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মধুসূদন দত্তের প্রহসন দুটি সব দিক থেকেই সাফল্যতা অর্জন করেছে। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত মধুসূদন দত্তের প্রহসন সম্পর্কে বলেছেন -

“মধুসূদনের প্রহসনের পথ ধরেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাট্যসাহিত্য সংস্কৃত নাট্যজগতের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাশ্চাত্য পদ্ধতির প্রতি আস্তা প্রকাশ করল।”^৪

অর্থাৎ আধুনিক রীতির নাটকের প্রথম পথ নির্মাণ করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তনই হল প্রহসন সৃষ্টির মূল কারণ। মূলত সমকালীন ঘটনা অবলম্বনে শাণিত রঙ্গ-ব্যঙ্গের ভাষায় প্রহসন রচিত হয়। প্রহসনের উদ্দেশ্য মূলত নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করা। প্রহসনের চরিত্রগুলি টাইপধর্মী হলেও তাদের মধ্যে স্বতন্ত্রতা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চরিত্রগুলি তাদের নিজ নিজ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে, আর প্রহসনে ব্যবহৃত সংলাপগুলি আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় তীর্থক রঙ্গ-ব্যঙ্গে হয়ে থাকে। প্রহসনের সংজ্ঞা হিসেবে ড. অশোককুমার মিশ্র মহাশয় বলেছেন—

“টাইপধর্মী চরিত্রগুলি তাদের নিজস্ব ভাষাভঙ্গি ও পরিবেশের সীমারেখায় সমকালীন বহু আলোচ্য ঘটনাবলীকে যখন এক থেকে দুই অঙ্কের সীমায় নাটিকায় জীবন্ত করে তোলে, তখন হাস্যরসাত্মক সেই নাটিকাকে বলা যায় প্রহসন।”^৫

মধুসূদন দত্ত মাত্র দু'খানা প্রহসন রচনা করেছিলেন। যথা 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০)। প্রহসন দুটিকে বিষয়বস্তুর নিরিখে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রহসন দুটিতে দুই বিপরীত মেরুর চিত্র অঙ্কন করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে দেখা যাচ্ছে 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত পাশ্চাত্য-বিলাসী ভাবধারার 'নবকুমার'রা কীভাবে সমাজকে আধুনিকতার নামে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে ইংরেজি শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের চাইতেও সমাজকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তৎকালীন রক্ষণশীল প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভিত্তিহীন প্রথা ও কু-ব্যবহার— যা স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় মধুসূদন দত্ত তাঁর এই প্রহসনে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ নাট্যকার দেখিয়েছেন সমাজের দুই শ্রেণীর মানুষকে, যারা কখনও নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার তাড়নায় সমগ্র সংস্কৃতিকে পদাঘাত করছে। আবার কখনও ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে নিজেদের কাম-বাসনাকে পূর্ণ করতে ধর্ম-কর্মকে জলাঞ্জলি দিচ্ছে। সমাজের এই ভণ্ড চিত্রগুলি মধুসূদন মূলত পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। আর এই পুরুষ চরিত্রগুলির স্বরূপ উন্মোচন করতেই নারী চরিত্রগুলির অবতারণা করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। আলোচ্য প্রবন্ধে মধুসূদন দত্তের প্রহসনে নারী চরিত্রের আলোকে পুরুষ চরিত্রের স্বরূপ উন্মোচন কীভাবে হয়েছে তার আলোচনায় অংশ নেব।

প্রহসন দুটিতে নারী চরিত্রগুলি বীরাঙ্গনা নয় ঠিকই কিন্তু তারা প্রত্যেকেই কুশলী বা বুদ্ধিমতী। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' (১৮৬০) প্রহসনে যেসব নারী চরিত্রগুলি রয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দুজন বারবিলাসিনী, প্রসন্নময়ী, নৃত্যকালী, কমলা, হরকামিনী, গৃহিণী। উল্লেখিত প্রত্যেকটি নারী চরিত্র তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা বজায় রেখে নিজ নিজ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। প্রথমে আসা যাক দুজন বারবিলাসিনীর কথায়। এই বারবিলাসিনীদ্বয়ের কথায় হাসির খোরাক যেমন আছে, তেমনি রয়েছে তৎকালীন সমাজের বারান্দা নারীর চিত্র। টাকার বিনিময়ে প্রাত্যহিক জীবনচর্চার প্রেক্ষাপট হাস্যকৌতুক ভঙ্গিতে সহজেই উঠে এসেছে। বাবাজীকে উদ্দেশ্য করে প্রথম ও দ্বিতীয় বারবিলাসিনীকে বলতে শোনা যায়—

প্রথম : “আহা, বাবাজী তোমার কি বস্তু হারিয়েছে? তা পথে পথে কেঁদে বেড়ালে কি হবে? যা হবার তা হয়েছে, কি করবে ভাই? এখন আমাদের সঙ্গে আসবে তো বল? –কেমন বামা, ভেক নিতে পারবি?”

দ্বিতীয় : “কেন পারব না? পাঁচ সিকে পেলেই পারি। কি বল, বাবাজী?”^৬

আবার হাস্যরস সৃষ্টিতেও চরিত্র দুটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের কাহিনির সূত্রে আমরা জানতে পারি যে, জ্ঞানতরঙ্গিনী হল এমন একটা সভা, যেখানে 'ইয়ং বেঙ্গল' ভাবাদর্শী নব্য ইংরেজি শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় সমাজকে আধুনিক করে তোলার জন্য উৎসাহ প্রদান করে এবং মদ্যপান ও বারবিলাসিনীদের নৃত্য দিয়ে সভার কার্য সম্পন্ন করে। এখানে সভার নামকরণ যেন আধুনিকতারই ব্যঙ্গাত্মক প্রতিফলন।

'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনে অন্যান্য নারী চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হরকামিনী চরিত্রটি। এই চরিত্রটি নিদারুণ দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। উগ্র আধুনিক ইংরেজি আদব কায়দায় অভ্যস্ত তার স্বামী নবকুমারের সব কু-কীর্তি তার জানা। জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে গিয়ে মদ-মাংস-গান-বাজনা আর বারান্দা বিলাসে অভ্যস্ত তার স্বামী। হরকামিনী নিজের মুখে তার দুর্দশার কথা স্বীকার করে বলেছে—

“...হায়, এই কল্কেতায় যে আজ কত অভাগা স্ত্রী আমার মতন এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে তার সীমা নাই হে বিধাতা! তুমি আমাদের উপর এত বাম হলে কেন?”^৭

অর্থাৎ নাট্যকার এই হরকামিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বা উগ্র আধুনিক যুবকদের স্ত্রীদের দুঃখ ও যন্ত্রণার কথায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার হরকামিনীর মুখে প্রতিবাদী ভাষাও শোনা যায়। তাকে কখনো বলতে শোনা যায়—

“...বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েছি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ্য মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? —একেই কি বলে সভ্যতা?”^৮

অর্থাৎ নাট্যকার তৎকালীন সমাজের ভণ্ডামির প্রতিবাদ জানিয়ে হরকামিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে সমাজের নবকুমারদের মতো পাশ্চাত্য বিলাসী ভাবধারায় ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদের ভণ্ডামিকেই তুলে ধরেছেন।

প্রসন্নময়ী অন্যতম একটি নারী চরিত্র। নাটকে সে নবকুমারের বোন, স্বামী পরিত্যক্ত। সে তার বৌদি হরকামিনী এবং নৃত্যকালী ও কমলার সাথে তাস খেলে বাড়ির অন্তরমহলেই সময় কাটায়। প্রসন্নময়ী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। তার দাদা নবকুমার জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা থেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে প্রসন্নকে চুমু খাওয়া বা অসংলগ্ন কোন কথাবার্তার প্রসঙ্গ তুলে ধরে, প্রসন্ন তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এছাড়া প্রসন্ন জানে যে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে কী কী হয়ে থাকে। তাই সে তার বৌদিকে বলে—

“তা এ আজ আর নতুন দেখিলি নাকি? জ্ঞানতরঙ্গিনী সভাতে এইরকম জ্ঞানই হয়ে থাকে।”^৯

অর্থাৎ নাট্যকার এই প্রসন্নময়ী চরিত্রটিকে একটি বুদ্ধিমতী নারী প্রতীক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। যে চরিত্রটির সৃষ্টির মূলে ছিল তৎকালীন সমাজে যারা সাহেবি কালচারে অভ্যস্ত তারা সাহেবদের মতো বোনের গালে চুমু খাচ্ছে যেটি আমাদের বাঙালি সমাজ একেবারে মেনে নিতে পারছে না।

নৃত্যকালী ও কমলা এই প্রহসনের অন্যতম দুটি নারী চরিত্র। নবকুমারের খুড়তুতো বোন নৃত্যকালী। সে প্রসন্নময়ী ও হরকামিনীর তাস খেলার সঙ্গী। আর কমলা তাদের প্রতিবেশী। নাটকে দেখা যায় নৃত্যকালী তাস খেলায় পটু হলেও কমলা অনেকটাই কাঁচা। কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরলে তা বোঝা যাবে।

“কমলা : বস, তুই পাগল হলি না কি লো? তোর হাতে সাহেব তা আমি টের পাব কেমন করে লা?”

নৃত্যকালী : তুই ভাই যদি তাস খেলা কাকে বলে তা জানতিস্ তবে অবিশ্যি টের পেতিস্।”^{১০}

অর্থাৎ, আধুনিকতার প্রতিফলন শুধু পুরুষ চরিত্রের মধ্যেই নয়, নারী চরিত্রগুলিকেও আধুনিক করে তুলতে নাট্যকার তাস খেলার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও নাট্যকার সম্ভবত এই নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন নারীর অন্তরমহলের বর্ণনার সুবিধার্থে।

গৃহিণী চরিত্রটি নাটকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। গৃহিণী হল নব কুমারের মা। গৃহিণীর অত্যাধিক পুত্র স্নেহ তার পুত্রের পতনের পথকে প্রশস্ত করেছে। বাঙালি সমাজের প্রত্যেকটি মা তার ছেলেকে যেমন অত্যাধিক বিশ্বাস করে, স্নেহ করে, তেমনি গৃহিণী চরিত্রটিকেও তৎকালীন বাঙালি মায়ের দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গৃহিণী পুত্রের দোষ ত্রুটিকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে। মদ্যপ অবস্থায় জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা থেকে ফেরার পর যখন নবকুমারের মাটিতে লুটিয়ে পড়া দেখে তার মায়ের অতিরিক্ত সন্তান বাৎসল্য আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুরুষ গৃহিণীর কাছে এখনও ‘দুধের বাছা’। নবকুমারের মায়ের বিশ্বাস তার ছেলে কোনো অন্যায় করেনি, দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় পড়ে সে এসব করেছে। ছেলের পক্ষ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সে তার স্বামীর প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নবকুমারকে তার স্বামী ‘দুরাচার’, ‘নরাধাম’, ‘কুলাঙ্গার’ বলে গালিগালাজ করলে গৃহিণী সরোষে বলে ওঠে –

“বুড়ো হলে লোক পাগল হয় না কি? যাও, তুমি আমার সোনার নবকে অমন কইরো বকচো কেন?”^{১১}

আবার নৃত্যকালী নবকুমারের মুখের বদ গন্ধের কথা গৃহিণীকে জানালে গৃহিণী বলে ওঠে—

“উঃ ছি! তাই তো লো। ও মা, এ কি সর্বনাশ। আমার দুধের বাছাকে কি কেউ বিষ টিষ্ খাইয়ে দিয়েছে না কি? ও মা আমার কি হবে।”^{১২}

এই বলে ক্রন্দন শুরু করে দেয়। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে যে গৃহিণী তার ছেলের দোষ ত্রুটি ধরতে পারলেও তাকে আড়াল করার চেষ্টা করেছে, যা নবকুমারের পতনের পথকে আরো একধাপ এগিয়ে দিচ্ছে।

অসাধারণ নাট্য প্রতিভার অধিকারি মধুসূদন দত্তের ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ (১৮৬০) প্রহসনটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ এই প্রতীকী নাম ব্যবহারের আসল গূঢ়ার্থ হল— রোঁয়া হল যৌবনের প্রতীক। শালিক পাখি যখন বৃদ্ধ হয় তখন তার ঘাড় রোঁয়া বিহীন হয়। অর্থাৎ যৌবনকাল নিঃশেষিত হয়। কিন্তু আলোচ্য প্রহসনের মূল চরিত্র ভক্ত প্রসাদের আচরণে তার বৈপরীত্য দেখা যায়। এই জমিদার ভক্ত প্রসাদের চরিত্রের উন্মোচনের জন্যই নাট্যকার সৃষ্টি করেছেন ফতেমা, পুঁটি, ভগী, পঞ্চসহ একাধিক নারী চরিত্র। এই প্রহসনে নারী চরিত্রগুলি নিজ নিজ স্তরের প্রতিনিধিত্ব করলেও ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের উন্মোচন-ই নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য।

প্রথমেই আসা যাক, এই প্রহসনের মূল নারী চরিত্র ফতেমার কথায়। হানিফের স্ত্রী ফতেমা। পূর্বে তার বিবাহ হয়েছিল কিন্তু বিধবা হলে তাকে হানিফ নিকা করেছে। ফতেমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। প্রহসনে ফতেমার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে ভক্ত প্রসাদের চাকর গদাধরের মুখ থেকে। ফতেমার রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে গদাধর বলে—

“মশায়, তার রূপের কথা আর কি বলবো” বয়েস বছর উনিশ, এখনও ছেলেপিলে হয় নি, আর রঙ যেন কাঁচা সোনা।”^{১৩}

নারীলোলুপ ভক্তপ্রসাদ নিজেকে হিন্দুত্বের শিরোমনি বলে মনে করে এবং মুসলমানদের ঘৃণা করে। যদিও তা ভক্তপ্রসাদের চাহিদার উপর নির্ভর করে। ভক্তপ্রসাদকে বলতে শোনা যায়— “মুসলমান মাগীদের মুখ দিয়ে যে প্যাঁজের গন্ধ ভক্ ভক্ করে বেরোয় তা মনে হলে বমি এসে।” কিংবা “মুসলমান! যবন! স্লেচ্ছ! পরকালটাও কি নষ্ট করবো!” আবার পরক্ষণেই বলতে শোনা যায়—

“হাঁ, স্ত্রীলোক— তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে; —‘বড় সুন্দরী বটে, অ্যাঁ’।”^{১৪}

কারণ নারীলোলুপ ভক্তপ্রসাদের ছলে বলে কৌশলে যেকোনো মূল্যে নারীদেহ প্রয়োজন। আর এই কাজে তাকে সাহায্য করে গদাধর। ভক্তপ্রসাদ গদাধরকে বলে যে —

“দেখ টাকার ভয় করিস না। যত খরচ লাগে আমি দেব।”^{১৫}

গদাধর তো এটাই চাইছিল। এভাবেই চাকর-বাকররা মনিবের সমস্ত অসৎকর্মে সহায়তা করে চলে। এই প্রহসনে গদাধর চরিত্রটিও ভক্তপ্রসাদের অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য তার পিসি পুঁটিকে হাত করে ফতেমাকে ভক্তপ্রসাদের হাতে তুলে দেওয়ার ছক কষে। তবে ফতেমা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তাই সে সুকৌশলে ভক্তপ্রসাদের থেকে টাকা হাতানোর জন্য ছক সাজিয়ে রাখে। সে তার স্বামী হানিফকে এ বিষয়টি জানিয়ে রাখে। অবশেষে যখন পুঁটি ফতেমাদের বাড়িতে আসে টাকা দেওয়ার জন্য, তখন দেখা যায় যে, ফতেমাকে এ কাজের জন্য ২৫ টাকা দেওয়ার কথা কিন্তু পুঁটি ৬ টাকা কম ১৯ টাকা দিয়ে বাকি ৬ টাকা তার কমিশন হিসেবে কেটে নেয়। তারপর ফতেমা তার থেকে আরও ২ টাকা আদায় করে নেয়। ফতেমার মধ্যে তির্যক ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদের ভাষাও শোনা যায়। পুঁটি যখন ফতেমাকে জাত তুলে অপমান করে তখন ফতেমাকেও বলতে শোনা যায়—

“মোরা রাঁড় হলি নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস বল দেখি।”^{১৬}

ফতেমার মধ্যে সামাজিক ভয়ও ছিল। তাই ভক্তপ্রসাদকে আসতে দেখে ফতেমা পুঁটির কাছে অনুরোধ করে তাকে সেখান থেকে নিয়ে যেতে। পরে ভক্তপ্রসাদ হানিফের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং বাচস্পতি ও হানিফের কাছে ধরা পড়ে যাই। নাটকে দেখা যাচ্ছে, জমিদার ভক্তপ্রসাদের মতো গোঁড়া হিন্দুত্বের শিরোমণিদের চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে ফতেমা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন নাট্যকার। ফতেমা দরিদ্র হলেও সে তার সম্মান রক্ষা করেছে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দ্বারা।

নাটকের অন্যতম একটি নারী চরিত্র হল পুঁটি। যে চরিত্রটিকে আমরা সাধারণত কুটিল চরিত্র হিসেবেই দেখি। এই চরিত্রটিকে মাঝখানে রেখে জমিদার নানা অসৎকার্য সিদ্ধ করে। এই পুঁটিকে দিয়েই জমিদার ফতেমাকে ভোগ করতে চেয়েছে। এবং ভোগ করেছে। পুঁটি মুসলমানদের ঘৃণা করলেও টাকার জন্য ফতেমাদের বাড়িতে এসেছে। আবার এই পুঁটির স্বগতোক্তি থেকেই জমিদারের চরিত্রের আসল দিকটি উন্মোচিত হয়। পুঁটিকে বলতে শোনা যায়—

“...আজ না হবে তো ত্রিশ বছর ওর কন্ম কচ্ছি, এতে যে কত কুলের ঝি বউ, কত রাঁড়, কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার ঠিকানা নাই। বাবু এদিকে আবার পরম বেষ্টম, মালা ঠকঠকিয়ে বেড়ান...।”^{১৭}

পুঁটি নিজেও তার পরকাল খুইয়েছে জমিদার ভক্তপ্রসাদের কুনজরে পড়ে। অর্থাৎ, এই ভক্তপ্রসাদের মতো নারীলোলুপ নারীসঙ্গ পেলে আর ধর্ম কর্মের ধার ধারে না। পুঁটির কাছ থেকেই হানিফ গাজীর শারীরিক বর্ণনার একটা আভাস পায়, সে যেন ‘যমের দূত’। অর্থাৎ হানিফ গাজী যে প্রচণ্ড শক্তিমান তা বোঝা যাচ্ছে। পুঁটি যখন ফতেমাকে নিয়ে ভগ্ন শিব মন্দিরের কাছে যায় তখন ফতেমা ভয়ে থাকতে পারবে না বলে পালিয়ে যেতে চাইলে পুঁটি স্বগতোক্তি করে বলে —

“হায়, আমার কি এখন আর সেকাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হলো আর তাকে কে খেতে চায়?”^{১৮}

উক্তিটি থেকে পুঁটির যৌবনকাল শেষ হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। প্রহসনের শেষে পুঁটি ও গদাধরের কথোপকথন থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পুঁটি একাজ ছেড়ে দিতে চেয়েছে। স্বীকার করেছে যে, এ কাজ ছেড়ে দেওয়ায় ভালো।

“গদাধর : (জনান্তিকে) ও পিসি, তবেই তো তোমার পেশা উঠলো!

পুঁটি : “উঠুক বাছা ; গতর থাকে তো ভিক্ষা মেগে খাবো।”^{১৯}

এছাড়াও এই প্রহসনে আরো তিনটি নারী চরিত্রের দেখা মেলে। তারা হল— ভগী, পঞ্চী, এবং ইচ্ছা। ভগী আর তার মেয়ে পঞ্চী জল আনতে যাওয়ার সময় জমিদার ভক্তপ্রসাদের কুনজরে পড়ে পঞ্চী। পঞ্চী বিবাহিত। ভগী তার কন্যাকে বিভবান ছেলের সাথে বিবাহ দিয়ে গর্ব অনুভব করেছে। ভগীকে তার জামাই সম্পর্কে বলতে শোনা যায়—

“আজ্ঞে, জামাইটি দেখতে বড় ভাল। আর কল্কেতায় লেখাপড়া শেখে। শুনেছি যে লাট সাহেব তারে

নাকি বড় ভালবাসেন, আর বছর বছর একখানা বই দিয়ে থাকেন।”^{২০}

ভগী গ্রাম্য সরল গৃহবধূ। তাই সে সুযোগ সন্ধানী ভক্তপ্রসাদের মতলব বুঝতে না পেরে তার স্বামী পীতাম্বর কেশবপুরের হাটে নুন আনতে গেছে বলে জানিয়ে দেয়। ভক্তপ্রসাদ এই সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য মতলব আঁটে পঞ্চীকে ভোগ করার। ভগী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে নাট্যকার ভক্তপ্রসাদের সুযোগ সন্ধানীর রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। নাটকে পঞ্চী চরিত্রটির একটি মাত্র উক্তি রয়েছে। নারীলোলুপ লম্পট জমিদার ভক্তপ্রসাদ তার স্বভাবসিদ্ধ কামনার তাড়নায় পঞ্চীকে একবার দেখেই তার রূপে মুগ্ধ হয়ে উঠেছে। পঞ্চী তার মায়ের নির্দেশে যখন ভক্তপ্রসাদকে প্রণাম করতে যায় তখন তার চোখের চাহনি দেখে পঞ্চী বুঝতে পারে যে ভক্তপ্রসাদ তাকে কুনজরে দেখছে। পঞ্চীর স্বগতোক্তি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট—

“ও মা! এ বড় মিন্‌সে তো কম নয় গা। একি আমাকে খেয়ে ফেলতে চায় না কি? ও মা! ছি! ও কি

গো! এ যে কেবল আমার বুকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে? মর!”^{২১}

অর্থাৎ জমিদার ভক্তপ্রসাদের নারীলোলুপ মানসিকতাকে চিত্রিত করতে গিয়েই পঞ্চী চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন নাট্যকার। এছাড়াও এই নাটকে ইচ্ছা ভট্টাচার্য নামে এক নারীর প্রসঙ্গ রয়েছে। যদিও নাটকে তার কোন সংলাপ নেই। ভক্তপ্রসাদের ভৃত্য গদাধরের মুখে ইচ্ছার নামটি শোনা যায়। ইচ্ছার থেকেও ফতেমা দেখতে ভাল— এটি বোঝানোর জন্যই গদাধর ইচ্ছার নামটি ব্যবহার করেছে। জমিদার ভক্তপ্রসাদ ইচ্ছাকে নষ্ট করে দেওয়ার পর কসবার বেশ্যালয়ে গিয়ে স্থান হয়েছিল তার। অর্থাৎ, নারীলোলুপ ভক্তপ্রসাদের কামনার শিকার হয় ইচ্ছা। আর এই ভক্তপ্রসাদের এই ভণ্ডামিকে তুলে ধরতেই ইচ্ছা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন নাট্যকার।

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, আলোচ্য দুটি প্রহসনেরই প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণে এবং এই তথাকথিত ভদ্র সমাজের স্বরূপ উন্মোচনে নারী চরিত্রগুলিকে স্বমহিমায় দেখা গেছে। প্রহসন দুটির কাহিনি সম্পূর্ণ বিপরীত। একটিতে যেমন রয়েছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অপব্যবহারের চিত্র, অপরটিতে তেমনই রয়েছে প্রাচ্য সংস্কৃতির ভণ্ডামির চিত্র। ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ প্রহসনে দেখা যাচ্ছে বাবু কালচারে অভ্যস্ত নবকুমারের মতো চরিত্রদের পরিবারের প্রতি বা স্ত্রীর প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আর এই চিত্রকে তুলে ধরতেই হরকামিনী চরিত্রটি, আবার বিদেশি কালচারে বোনের গালে চুমু খাওয়ার ঘটনাকে তুলে ধরতে প্রসন্নময়ী চরিত্রটি, আবার সচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরমহলে চিত্র তুলে ধরতেই নৃত্যকালী ও কমলা চরিত্রের অবতারণা। এছাড়াও গৃহিণী চরিত্রটি পুত্রস্নেহে অন্ধ এমন মাতৃহের পরিচয় বহন করে চলেছে। অনুরূপভাবে, ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ প্রহসনের মূল চরিত্র ভক্তপ্রসাদের ভণ্ডামিকে তুলে ধরতেই নাটকে নারী চরিত্রগুলি নির্মাণ করেছেন নাট্যকার। প্রতিটি নারী চরিত্রই স্বমহিমায় উজ্জ্বল থেকে পুরুষ চরিত্রগুলির স্বরূপ উন্মোচন করে সমকালীন সামাজিক সমস্যাগুলিকে চিত্রিত করেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

Reference:

১. বসু, যোগীন্দ্রনাথ, ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, চতুর্থ দে’জ সংস্করণ : ২০১১, পৃ. ৪৪১
২. মিশ্র, ড. অশোককুমার, ‘বাংলা প্রহসনের ইতিহাস’, গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ২০১৪, পৃ ৪০
৩. গুপ্ত, ক্ষেত্র, ‘নাট্যকার মধুসূদন’, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৬ ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ ১৩৭

৪. তদেব, ১৪২

৫. মিশ্র, ড. অশোককুমার, 'বাংলা প্রহসনের ইতিহাস', গ্রন্থ বিকাশ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০১৪, পৃ ৩১

৬. মণ্ডল, ড. তপন, 'মধুসূদনের প্রহসন : কালের দর্পণ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০১০, পৃ. ১৩১

৭. তদেব, পৃ. ১৪৬

৮. তদেব, পৃ. ১৪৬

৯. তদেব, পৃ. ১৪৬

১০. তদেব, পৃ. ১৪২

১১. তদেব, পৃ. ১৪৫

১২. তদেব, পৃ. ১৪৫

১৩. তদেব, পৃ. ১৪৯

১৪. তদেব, পৃ. ১৪৯

১৫. তদেব, পৃ. ১৫১

১৬. তদেব, পৃ. ১৫৫

১৭. তদেব, পৃ. ১৫৪

১৮. তদেব, পৃ. ১৬৩

১৯. তদেব, পৃ. ১৬৭

২০. তদেব, পৃ. ১৫২

২১. তদেব, পৃ. ১৫৩